কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

হুমায়ুন আজাদের কবিতা: আধুনিক বাঙালির আত্মপ্রতিকৃতি ও নির্মাণ

কবির আহমেদ*

Abstract: Humayun Azad (1947–2004) has depicted the concept of "modern Bengali," which emerged in the 1960s, throughout many of his poems. In the preface to his Selected Poems, Azad wrote that poetry, to him, is the endless expansion of beauty, the infinite stirring of the senses, the dispassionate wisdom of a fossil-like sage, the unwavering outpouring of meditation, the primal exuberant celebration of life, and the everglowing embers of metaphor, symbol, and imagery. His poetry captured the finest emotional experiences of time,desire, longing and aesthetic sensibility. In his work, the most creatively expressive form of the Bengali language unfolds through extraordinary imagery, similes, rhythm, and refined structural artistry. He embodies the modern Bengali in every sense, moving beyond the city to embrace nature, experiencing the neglected margins with a modern consciousness. Humayun gave voice to the profound sense of mortality and personal anguish in his poetry with rare sincerity. This article explores the aesthetic principles in Humayun Azad's poetry within the framework of the concept of the "modern Bengali," through detailed analysis and deep introspection.

বাংলাদেশের কবিতা হাজার বছরের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। অসংখ্য কবির অপরূপ বাণী, দর্শন, চিত্রকল্প, প্রতীক ও ছন্দের লাবণ্যে এদেশের কবিতার নান্দনিক অবয়বটি গড়ে উঠেছে। সময়ের চলমান জীবনস্রোত, সমাজ ও রাজনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলাদেশের কবিতার হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছে বিচিত্র শ্রেণির দার্শনিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মনন। ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা, আপাতবিরোধিতা, হতাশা অথবা উল্লাস, আত্মঘাতী ক্রোধ কিংবা আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণের প্রবল বা অপরূপ উত্তেজনা, ক্লান্তি অথবা বিভীষিকা প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর জটিল সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষোভে আধুনিক বাংলা কবিতা আলোড়িত হয়েছে। সাহিত্য তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ কিংবা ভাষ্য থেকে জানতে পারি যে, আধুনিকতা বিষয়ক ভাবনা কোনো নির্দিষ্ট গতিরেখায় এগিয়ে যায়নি বরং স্থান-কাল-অঞ্চলভেদে অথবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে আধুনিকতা ভিন্ন ভিন্ন চারিত্র্য গ্রহণ করেছে। কবিতার আধুনিকতা সেই অর্থে কোনো মানদণ্ড দ্বারা চালিত হয়নি। এলিয়টীয় উদাহরণে বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক কবিতা ব্যক্তির প্রস্থানের ভিতর দিয়ে সূচিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছেন যে,আধুনিক কবির 'বিষয়ীর আত্মতা' নয় বরং 'বিষয়ের আত্মতা' মুখ্য (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭: ৪৬৬)। কিন্তু রিলকের কবিতায় ব্যক্তিই চরম আরাধ্য। বাংলা কবিতায় 'আধুনিক' বিবেচনায় পাঠ করা হয় উনিশ শতকের নবীন কবিতাকে। কিন্তু সেই সময়ে রচিত কবিদের কবিতা সম্পর্কে যে 'আধুনিক' তকমা বহুল ব্যবহৃত তা মূলত রোমান্টিক কাব্যাদর্শেরই নামান্তর। কেননা, 'যুগের আধুনিকতা' এবং 'সাহিত্যের আধুনিকতা'–এই দুই আধুনিকতায় রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কবিতার বিষয় ও প্রকরণ কৌশলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলত ইউরোপে আঠারো শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক বিষয়াদি উপেক্ষা করে নবচিন্তার সংক্রমণে যেসমস্ত কবিতা লিখিত হয়েছিল, সেসব কবিতাকে রোমান্টিক কবিতা বলা হয় সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে। ইউরোপীয় চার্চ ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রোমান্টিক কবিতা হয়ে উঠেছিল বিপুল দ্রোহের স্মারক। পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদ

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্ভূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবতাবাদ এক্ষেত্রে রসদ যুগিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং মানবতাবাদের কূলপ্লাবীপ্রভাব নির্মিত হয়েছিল মূলত ইউরোপীয় নবোদ্ভূত পুঁজিবাদ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে। নবোদ্ভূত আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের হ্রাসকরণকে ত্বরান্বিত করে এবং সূচনা করে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের। ভারতবর্ষ 'সেই নতুন ভূমি' হিসেবে বিবেচিত। উনিশ ও বিশশতকের প্রথম দিকে বিভিন্ন কবির রচিত রোমান্টিক কবিতা যা 'আধুনিক' হিসেবে পাঠ করা হয় তা যেমন প্রতীচ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত তেমনি ত্রিশের আধুনিক কবিতা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হলেও এই ধারার কবিতাই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবিতা। হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টবাক, আঙ্গিক সচেতন, বিশেষত বিশ শতকের তিরিশি কবিতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনা সম্প্রকাশিত ও ক্রিয়াশীল। তিনি ষাটের দশকের কবিতায় মূল সুরকে আত্মস্থ করেছেন – কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠ নন। তাঁর কবিতা প্রতিবাদ ও তীব্র ঘৃণা প্রকাশের সর্বোচ্চ প্রকাশ হলেও তা কখনো হয়ে ওঠেনি উচ্চকণ্ঠের। বরং তিনি সমকালকে ধারণ করে অনাগত এক রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। হুমায়ুন লেখেন:

> লিখেছি সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে, আমার ভেতরের চোখ যে-শোভা দেখে, তা আঁকার জন্যে; আমার মন যেভাবে কেঁপে ওঠে; সে কম্পন ধ'রে রাখার জন্যে। মানুষের অনন্ত সৃষ্টিশীলতা আমার ভেতর দিয়েও প্রকাশ পাক কিছুটা, এমন একটা ব্যাপারও হয়তো আছে। (হুমায়ুন, ২০০৮:ভূমিকা)

*শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় তিনি তাঁর কবিতাকে আখ্যা দিয়েছেন ঝিনুকের জ্যোতির্ময় ব্যাধি হিসেবে। কবির ভাষায়:

> চূড়ান্ত অর্থহীনতাকে অর্থজ্যোতির্ময় করার জন্যেই দরকার কবিতা। ঝিনুক তার ব্যাধিকে রূপান্তরিত করে মুক্তোয়, কবিতাও মহাজাগতিক নিরর্থকতাকে জ্যোতির্ময় মুক্তোয় রূপান্তরিত করার রসায়ন। আমিও তাই করেছি। (হুমায়ুন, ১৯৯৩:ভূমিকা)

বিশ শতকের ষাটের দশকের কবিতার সচেতন শিল্পী হুমায়ুন আজাদ। আবেগের পরিশীলিত বোধ এবং শিল্পরূপ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। হুমায়ুন আজাদের কাব্যগ্রন্থ সাতটি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অলৌকিক ইস্টিমার* (প্রকাশকাল: ১৯৭৩, মোট কবিতা: ৪২টি) এরপর রয়েছে যথাক্রমে *জ্বলো চিতাবাঘ* (প্র.১৯৮০, মোট কবিতা: ৪৯টি), *সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* (প্র.১৯৮৫, মোট কবিতা: ২৪টি), *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল* (প্র. ১৯৮৭, মোট কবিতা: ২৮টি), *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* (প্র.১৯৯০, মোট কবিতা: ২৭টি), *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* (প্র.১৯৯৮, মোট কবিতা: ৪৪টি), *পেরোনোর কিছু নেই* (প্র.২০০৪, মোট কবিতা: ৫৩টি)। এছাড়াও রয়েছে ৯টি কিশোর কবিতা, ১৩টি অনুবাদ কবিতা (জন কীট্‌সের ১টি, ম্যাথিউ অ্যারনল্ড এর ১টি, ডব্লিউ বি ই এটসের ২টি, ই ই কামিংসের ১টি এবং হাইনরিশ হাইনের ৮টি), ৩টি অগ্রন্থিত কবিতা। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন অদম্য একজন কবি, তাঁর কবিতায় রয়েছে এক অন্তর্বাহী বৈশিষ্ট্য যা মূলত পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে। তাঁর কবিতার অসাধারণত্ব নির্ণীত হয় তাঁর ব্যক্তিত্বময় ভাষায়, চেতনসঞ্চারে এবং অপার অস্মিতায়। জীবন ও জগতের সামূহিক নেতিকে চিহ্নিত করেও তিনি ছিলেন আশাবাদী। তিনি নিরর্থকতার ক্লিশিত বেদনা-যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করেই হয়ে উঠেছিলেন নান্দনিক জীবনবিহারী। প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে উদ্ভূত আস্তিত্বিক অনিশ্চিতিতে উৎকণ্ঠিত হলেও বলেছেন যে, প্রতিক্রিয়া অবিনশ্বর নয়, প্রগতিই মানবিক ও চিরায়ু।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিতা যত বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছে, এত বৈচিত্র্য অন্য কোনো সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা আর ষাটের তারুণ্যসহ হয়ে উঠেছে সর্বত্রগামী। সমালোচকের অভিমত:

> পাপবোধ, পঙ্কিলতার গ্লানি, অবক্ষয়িত অন্তরাত্মার প্রতীতিতে একগুচ্ছ রোমশ অন্ধকারে বিচ্ছুরিত দ্যুতির মতো ছিটকে পড়েছেন ষাটের কবিরা। বিরুদ্ধ সময়, অবলম্বনহীন অবস্থান, অগ্রজে অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে তাঁদের করেছে সংঘবিচ্ছিন্ন, প্রথাবিরোধী, অবক্ষয়িত অন্তরাত্মায় নিপতিত। (বায়তুল্লাহ্,২০১৯: ৩৬)

ষাটের দশকের কবিতার মধ্যকার অবক্ষয়, নৈরাশ্য, হতাশা আর আশাভঙ্গতার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবরুদ্ধতা, পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ, পূর্ববাংলায় শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব, জাতিগত বৈষম্য, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে অনৈক্য ইত্যাদি কারণে ষাটের দশকের কবিবৃন্দ তাঁদের সামনে বড়ো কোনো আদর্শ এবং সম্ভাবনা দেখতে পাননি। এ দশকের তরুণ কবিদের মধ্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিকতা ছিল না। কবিদের এ মানসিকতার মূলে ষাটের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থনীতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। সম্ভাবনাহীন আইউবি কালোদশক, পাকিস্তানি অখণ্ডতার স্লোগান, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, চারদিকে অনেক পূর্বসূরির পাকিস্তানি শাসকচক্রের কাছে নির্লজ্জ আত্মবিক্রয়, বামপন্থী আন্দোলনের বিভক্তি, আমেরিকান পুঁজির বিস্তারে পূর্ববর্তী কবিদের বিচরণ প্রভৃতি সামজিক, রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলি ষাটের কবিদের মানস গঠনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। প্রচলিত মূল্যবোধকে তাঁরা তীব্র আঘাতে ভাঙতে চেয়েছেন। ষাটের কবিরা সমাজ জীবন ও স্বদেশকে মূল্যায়ন করলেন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ষাটের কবিদের কাছে অগ্রাহ্য হয়েছে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রথাগত প্রেম ও সংস্কারে কবিরা বিমুখ। তাঁদের কাব্যভাবনায় রয়েছে আত্ম-স্বীকৃতি, পাপবোধ এবং তজ্জনিত জীবনাচার, প্রথাগত সংস্কারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। পাপবোধস্থিতি, অপরাধ-প্রবণ মানসিকতা থেকে আত্মস্বীকরণ, দেশজ মাটি-মানুষের শেকড়ে সংলগ্ন হবার মানসিকতা তাঁদের কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে। বোদলেয়ারের কবিতায় অবক্ষয় যেমন তাঁর সময়ের স্বদেশের সমাজের শিল্পভাষ্য, তেমনি ষাটের তরুণ কবিদের কবিতা ও স্বকালের স্বদেশের বিনষ্টি, অপচয় এবং অবক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত। হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, 'অবশ্য কারো বন্দনা দিতে/পারে না তৃপ্তি/ কোনো বিশ্বাস অনির্বচন/ দেয় না দীপ্তি/ আমি শুধু বমনার্ত সংকলিত মলভাণ্ড সামনে রেখে/বলি: জননী তো প্রজননী পিতৃদেব অস্তিত্বঘাতক....।' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৯)। ষাটের তরুণ কবিকুল সর্বৈব নাস্তিক, নৈরাশ্য, হতাশা আর অবক্ষয়কে আলিঙ্গন করেছেন। মূলত এই নাস্তিক্য, নৈরাশ্য, হতাশা আর অবক্ষয় প্রকাশের মধ্যে ছিল তীব্র দহন এবং দ্রোহী চেতনা। ষাটের দশকের অন্যতম কবি রফিক আজাদ তাই কবিতায় লিখেছেন: 'সমুদ্র অনেক দূর, নগরের ধারে-কাছে নেই:/ চারপাশে অগভীর অস্বচ্ছ মলিন জলরাশি।/ রক্ত-পুঁজে মাখামাখি আমাদের ভালোবাসাবাসি;/ এখন পাবো না আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই' (রফিক, ২০১৩: ১২)। আবুল হাসান বলেছেন: 'শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শাণিত দুর্দিন,/বন্যার অবরোধ আহত বাতাস (আবুল, ২০১২: ৪৫)। আজাদ প্রচলিত প্রথা ও সীমাবদ্ধতার সবল দেয়াল ভেঙ্গে তিনি নিজের মহাসড়ক রচনা করেছেন নির্দ্বিধায়-নির্ভয়ে। সাহসের তরবারি হাতে এগিয়ে গেছেন সকল মূর্খতা, অন্ধকার আর দেয়ালের বিরুদ্ধে, আজীবন লড়াই করেছেন কথায় ও শব্দে সকল ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। সমালোচক বলেন:

> তাঁর কবিতায় ভালো শুধু ভালো হিসেবেই আসেনি, এসেছে মন্দের বিপরীত হিসেবে; আবার মন্দ ও পরিত্যক্ত নয়, বরং জারিত জীবন-সংঘাতের মিথস্ক্রিয়ায়। হুমায়ুন আজাদের কবিতা উঠে এসেছে কবির নাগরিকবোধ থেকে। আর এই নাগরিক বৈশিষ্ট্য সাঙ্গীকরণের মাধ্যমেই তিনি আধুনিক। কবিতায় মিশেছে তাঁর বুদ্ধি-হৃদয়-কল্পনা। (সৌমিত্র, ২০২১: ১৩৪)

হুমায়ুন আজাদ ষাটের দ্বিতীয় পর্বের কবি। তাঁর কবিতায় রাজনীতিচেতনা ও সমাজ সংশ্লেষী মনোভাবের সঙ্গে অবক্ষয়িত জীবনভঙ্গির মিশ্রণে একধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্যযোগ্য। হুমায়ুন প্রচলরীতির বিরুদ্ধে

সোচ্চার। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নঞর্থক চেতনায় উচ্চারিত হলেও তার মধ্যে রয়েছে গভীর অস্তিবোধ। মুক্ত চিন্তাঋদ্ধ, ব্যক্তির অধিকারপূর্ণ, বদ্ধ-মতাদর্শহীন, স্বচ্ছল-সৃষ্টিশীল, ভবিষ্যৎমুখী সুস্থ সমাজের স্বপ্ন তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, প্রথা, বৃত্তাবদ্ধ জীবনাচার, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, ব্যক্তিক সম্পর্ক ও প্রেমচেতনায় আজাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। স্বদেশ, স্বকাল, নারী, রাজনীতি, নিসর্গ প্রকৃতি হুমায়ুনের কবিতায় প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছে।

মালার্মে শব্দকেই করে তুলতে চেয়েছেন কবিতার কেন্দ্র। অর্থের দিক থেকে নয়, শরীরের দিক থেকে (মোহাম্মদ, ২০২১: ২৩০)। এই ধারণার অন্যতম তাৎপর্য এই যে, এক শব্দ আরেক শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যে কাব্যভাষা তৈরি করে তা কোনো বাস্তবকে বহন বা ধারণ করার দায় না নিয়ে নিজেই তৈরি করে ধারণার জগৎ, কাব্য বা কবিতা হয়ে ওঠে স্বনির্ভর অস্তিত্ব। শিল্পকলাকে নাগরিক যাপন ও উপলব্ধির প্রকাশ হিসেবে ঘোষণা ইউরোপে উনিশ শতকে জোরালো হয়ে উঠে। বোদলেয়ারের কাব্যকৃতিতে তা প্রকটভাবে প্রকাশ হতে দেখি। আর ফিউচারিস্ট দল তো চেয়েছিলেন শিল্পকে যুদ্ধাস্ত্রের সমরূপ করে তুলতে। ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী শিল্পকলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণা ব্যাপকভাবে চর্চিত হতে দেখি তিরিশের দশকের বাংলা কবিতায়। তখন নেতিধর্মই হয়ে উঠেছিল কাব্যকৃতির প্রধান আধুনিকতা। হুমায়ুন আজাদ প্রথম থেকেই এ পথে অগ্রসর হয়েছেন। আধুনিকতাবাদী পশ্চিমা কাব্যধারণার কোনো কোনো উপাদান বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কলকাতার তিরিশি কবিতায়। মালার্মে, বোদলেয়ার, এলিয়ট, ফর্মালিস্ট, ফিউচারিস্ট দল নতুন মূর্তি পেয়েছে কলকাতার কাব্যচর্চায়। ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের অনুবাদসূত্রে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। হুমায়ুন আজাদের কাব্যকলায় সেই কাব্যভাবনার অনুরণন স্পষ্ট। সমালোচক বলেন:

> কবিতায় শব্দকে নির্মাণ করেন, সমস্ত রূপ-রস-গন্ধকে ইমেজে ভাসিয়ে নির্মেদ অন্তঃসারকে যেন ছেনে তোলেন। প্রেম-প্রকৃতি-নারী নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে কিন্তু ভেতরে থাকে তীব্র ক্রোধ আর বিনষ্টির সংবাদ। পরাবাস্তব অনুভূতি কিংবা অ্যাবসার্ড বিমূর্তলোক ও অনুভববেদ্য রূপ পায় তাঁর কবিতায়। হুমায়ুনের আবেগ শুধু রোমান্টিক নয়; খুব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে বুদ্ধির শাসন। আর সেই রূপেই তাঁর শব্দ তৈরি হয়। (শহীদ, ২০১৯: ৮৮)

হুমায়ুন আজাদ ফরমালিস্টদের ধারণার সাথেও পরিচিত ছিলেন, যাঁরা চেয়েছিলেন অপরাপর শাস্ত্র বা এলাকার উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে কবিতাকে বা শিল্পকলাকে করে তুলবেন স্বাধীন, স্বনির্ভর, সার্বভৌম।

কলকাতার 'হাংরি জেনারেশন' এবং ঢাকায় 'স্যাড জেনারেশন' কবিতার ক্ষেত্রে একটি অভিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে নতুনতর উন্মাদনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা পঞ্চাশের কবিদের ধারাবাহিক গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটি ভিন্নতর অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল। ষাটের তরুণ কবিরা ঘোষণা করেছিলেন – মৃত্যু, যৌনতা, নিয়তি, ধ্বংস, ব্যাধি, হৃদয়, ভালোবাসা, অর্থ–সবকিছুই তাঁদের কাছে অর্থহীন, তুচ্ছ। এঁরা ছিলেন প্রবলভাবে এস্টাব্লিশমেন্টবিরোধী। ভাঙন আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির উৎসব করাই ছিল এঁদের প্রতিজ্ঞা। যে শূন্যতা, অসহায়তা, আত্মদীর্ণতা, নিঃসঙ্গতা, সংশয়, উদ্‌বেগ, আতঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতাবোধ ষাটের কবিদের দগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত, পীড়িত করে তোলে এবং ধ্বংসের কিনারে দাঁড় করায়, আধুনিক কাব্যকলা তো তাঁদের আরো ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, সূক্ষ্ম ও সম্প্রসারিত করবেই। সমালোচক বলেন:

> বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে কোনো সময়ের কবিতা-ই বোধ করি এত নৈরাশ্য, নাস্তি, অবক্ষয় আর দম বন্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেনি। ষাটের তরুণ কবিদের কবিতা পড়তে গেলে প্রতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠানের হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ সহজেই কানে লাগে। (কুদরত, ২০২২: ২১২)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবি হুমায়ুন আজাদ তাঁর কাব্যভুবনে নিজের আবেগ-অনুভূতি, স্বদেশ-সমাজ, দর্শন, প্রেম, নিসর্গ ও শিল্প-সাফল্যে পৃথক হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতা বিষয় ও নির্মিতিতে হয়ে উঠেছে বহুপ্রান্তস্পর্শী, নতুন ও বৈচিত্র্যপ্রয়াসী।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ঢাকার সমাজ, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কলকাতা থেকে বহু শিক্ষিত, অভিজাত ও সংস্কৃতিমনস্ক হিন্দু বাঙালির প্রস্থান এবং পূর্ববঙ্গে নানা শ্রেণি পেশার মুসলিম বাঙালির রাজধানীমুখী আগমন ঢাকার সামাজিক চারিত্র্যকে আমূল বদলে দেয়। এ সময় গড়ে উঠতে থাকে একটি নতুন নাগরিকশ্রেণি যাঁদের বলা হয় পরবর্তী ঢাকার আধুনিক বাঙালি। এই আধুনিক বাঙালির গঠন প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা রাখে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রিন্ট মিডিয়া, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে এঁদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্র, আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তাঁদের আত্মপরিচয়ের মূল আধার। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ আধুনিক বাঙালির পরিচয়ে যুক্ত হয় জাতীয়তাবাদের মৌলিক ধারা। তাঁরা ছিলেন ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য সোচ্চার, তবে একই সঙ্গে পেশাগত, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মনোভঙ্গির আধার। তাঁরা একদিকে রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত; অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন, মার্কসবাদ কিংবা অস্তিত্ববাদেও আগ্রহী। এই শ্রেণির অনেকেই জড়িয়ে পড়েন সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতায়। তাঁরা শহরের সংস্কৃতিকে আধুনিক ধারায় পরিচালিত করেন, আবার গণতন্ত্র, সমানাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিয়ে সচেতনভাবে ভাবেন। তবে এ আধুনিক বাঙালির জীবনদর্শন ছিল দ্বৈততায় ভরা – একদিকে পশ্চিমা আধুনিকতা, অন্যদিকে বাঙালি ঐতিহ্য; একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন, অন্যদিকে প্রগতিশীল মনোভব। এই দ্বৈততা-সংকট, সংগ্রাম ও আত্ম অন্বেষণেই গড়ে ওঠে ঢাকার আধুনিক বাঙালির অনন্য পরিচয়। আজাদের কবিতার দার্শনিক অভিজ্ঞান তাঁর মনন, প্রজ্ঞা, সমাজ, দেশকাল-প্রেক্ষাপট ও ব্যক্তিগত জীবনাকাঙ্ক্ষার সূত্রেই নির্মিত হয়েছে। তবে তাঁর এই দর্শনভাবনায় আবহমান প্রাচ্যদর্শনচেতনার প্রভাব ততটা প্রতিফলিত হয়নি, যতটা হয়েছে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের প্রভাব। অধীত বিদ্যা, পাশ্চাত্য সাহিত্য-পঠনজনিত প্রতিক্রিয়া, সমকালীন জাতিক ও আন্তর্জাতিক কাব্যান্দোলনের প্রভাব কবির কাব্যভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, উচ্চাভিলাষী প্রেমবোধ, অস্তিত্বসংকট, অভিযোজন-অক্ষমতা ও বৈরী সময়ের অবলম্বন হিসেবেই আজাদের কবিতায় দর্শনচিন্তা উন্মোচিত হয়।

অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্য। কাব্যের কবিতাগুলো ১৯৬৮-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এই কাব্যের প্রথম কবিতা ‘স্নানের জন্যে’ তিরিশ চরণবিশিষ্ট সাতটি স্তবকে বিন্যস্ত। কবিতাটিতে পঙ্কিল সমকাল এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রতীকী পরিচর্যার মাধ্যমে উপমা, উৎপ্রেক্ষার আবরণে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ‘সব সাংবাদিক জানেন’ কবিতায় কবির স্বদেশচেতনা, সমকালভাবনা ও নোংরা মূল্যবোধের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। ‘ব্যাধি’ কবিতায় রয়েছে পাশ্চাত্য কবি শার্ল বোদলেয়ারের ‘চুল’ কবিতার প্রভাব। সমকাল, অসুস্থ সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নিদারুণ বাস্তবসম্মতরূপে। ইতি-নেতি, বড়-ছোট এরকম বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে ‘শালগাছ’ কবিতায়। পরাবাস্তব বর্ণনা, শব্দচয়নে কবির দক্ষতা কবিতাটিকে শিল্পঋদ্ধ করে তুলেছে। কবি যতই নিজের কবিসত্তার গভীর প্রবেশ করেন সেখানে রয়েছে সত্য, সুন্দর, কল্যাণের শিল্পজগৎ, সেখান থেকে যতই তিনি পরিবেশ, সমাজ, স্বকাল, রাষ্ট্রের ভেতরে প্রবেশ করেন ততই যে তা বিষবৎ। সমকালীন বিষাক্ত পরিবেশ কবিকে দগ্ধ করেছে। সমকালের অসংলগ্নতা, অসভ্যতা, বর্বরতা, হতাশা, সংবাদপত্রের

দলীয়করণ, মূল্যবোধহীনতা কবিকে রক্তাক্ত করেছে, এবং তা ভাষারূপ পেয়েছে 'উন্মাদ ও অন্ধরা', 'বন্যা', 'এক বছর' শীর্ষক কবিতায়। 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' শীর্ষক কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্র, প্রেম, শিল্প, ধর্ম, মূল্যবোধ- সব কিছুই নষ্টদের অধিকারে যাবে তার আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। সমকালে কবিকে নানা বিদ্রূপের বাণ সহ্য করতে হয়েছে। তারই প্রতিবাদস্বরূপ 'আমি কি ছুঁয়ে ফেলবো' কবিতায় কবি শ্লেষের মাধ্যমে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন। ব্যাধিগ্রস্ত সমকালে ব্যাধিকে এড়িয়ে চলা যায় না তাই কবি ব্যাধিকেই শিল্পে পরিণত করেছেন 'ব্যাধি রূপান্তরিত করেছি মুক্তোয়' শীর্ষক কবিতায়। 'অনুপ্রাণিত কবি আর প্রেমিকের মতো' শীর্ষক কবিতায় কবির শিল্পবোধ, স্বদেশচেতনা, সমকালে শিল্পের হত্যা, পরাধীন মনস্তত্ত্ব, সভ্যতার নামে গড়া অসভ্যতার প্রকাশ প্রভৃতি অনুষঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। 'একটি অটোগ্রাফ' কবিতায় সাহিত্যিকদের অসহায়ত্ব, নজরুলকে স্মরণ ও নিজেকে নজরুলের উত্তরসূরি হিসেবে উপস্থাপনসহ সমকালীন সমাজ সভ্যতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। 'পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে' শীর্ষক কবিতায় সমগ্র বাংলার ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরেছেন। বাঙালি, নদী, পাখি, জোনাকি, ধানের শিষ, আত্মীয়, স্ত্রী, কন্যা, ভ্রূণ, ছাত্র, ছাত্রের প্রেমিকা, চাষি, শ্রমিক, রিকশাঅলা, ঠেলাঅলা, কাজের মেয়ে সবাই বিপর্যস্ত পঙ্গু। 'এসো, হে অশুভ' ও 'নষ্ট হৃৎপিণ্ডের মতো বাঙলাদেশ' কবিতায় সমকালীন বাস্তবতা উঠে এসেছে। আজাদ আহ্বান করেছেন অশুভশক্তিকে যিনি মহাসমারোহে এসে সমস্ত বর্বরতাকে ধ্বংস করে দেবেন। কবির স্বদেশচেতনাও প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য কবিতা দুটিতে। পচা-গলা বর্তমান সভ্যতার নষ্টরা সংঘবদ্ধ আর যারা সত্যিকার মানবিক তাদের দুরবস্থা প্রকাশ করেছেন 'আমার চোখের সামনে' শীর্ষক কবিতায়। সমকালকে কবি দেখেছেন অন্ধকারময় সময় হিসেবে। সমকালের প্রতি কবির ক্ষোভ, ঘৃণা, অভিমান প্রকাশ পেয়েছে 'পুত্রকন্যাদের প্রতি মনে মনে' কবিতায়। সমকালে ঘাতক, দস্যু, ধর্ষকদের নৃশংসতা, অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, অশ্লীল উৎসব দেখে কবি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন কিন্তু নির্বাক দর্শকের মতো আমরণ তাঁকে এসব সহ্য করে যেতে হবে; 'চুপ করে থাকার সময়' কবিতায় এ-ভাবই ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'হ্যামেলিনের বাঁশিঅলা' কবিতায় কবি রূপকথার আশ্রয়ে সমকালের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে নবাগতদের মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন। 'শামসুর রাহমানকে দেখে ফিরে' কবিতায় বর্বরতাপূর্ণ বাংলার ছবি এঁকেছেন। শামসুর রাহমানের মতো বড় প্রতিভা এই বাংলায় প্রত্যাঘাত জর্জরিত, অবহেলিত; আজাদও এই দিক থেকে রাহমানের উত্তরসূরি। 'বাঙলাদেশের কথা' কবিতায় সমকালীন বাস্তবতায় কবির রক্তাক্ত হৃদয়ের ক্ষরণ ভাষারূপ পেয়েছে। হুমায়ুনের সমকালভাবনার প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

ক. এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো ক্রমশ ধূসর হয়ে যাবে
নোংরা চক্রান্তের মতো সাইক্লোন দুর্ভিক্ষ এই দেশে আসে
পিতামহদের পাজামা পাঞ্জাবি ভ'রে প'চে গ'লে
লেগে আছে নোংরা মূল্যবোধ
আব্বার আস্তিনে শুধু শয়তানি
আর ট্রাউজারের প্রতিটি বোতাম প্রতিক্রিয়াশীল। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৪৬)

খ. নিই পরীর পেয়ারাস্তন, গোপন সোনালি চুল জড়াই আঙুলে
কাটি শাদা দাঁতে। ডুবে থাকি মাখনের স্বাদে।
এক অসুস্থ সভ্যতা, দুরারোগ্য, প'ড়ে আছি,
নর্দমার তটদেশে, পাশের বস্তিতে নাচে আধন্যাংটো
বিকৃত রুগ্ন পরীরা। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৮৬)

গ. হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি;

উৎফুল্ল হয় না কিছুতে-প্রেমে, পুষ্পে, সঙ্গমে ও সুখী
হয় না কখনো;
ওকে বাদ দেয়া হোক, নষ্ট বদমাশ হতাশসংবাদী।'
-এ আঁধারে উন্মাদ ও অন্ধরাই শুধু আশাবাদী। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৯৭)

ঘ. শুয়ে আছি বিষধর সর্পদের ভিড়ে
তাদের চুম্বনে ঠোঁটে, হৃৎপিণ্ডে দিনরাত জমছে অমৃত (হুমায়ুন, ২০০৮: ২৩২)

ঙ. এখন সংঘবদ্ধ দেখি নষ্টদের, ঘাতক, ডাকাত. ভণ্ড আর
প্রতারকেরাই উদ্দীপনাভরে নিচ্ছে সংঘের শরণ।
যারা মানবিক, তারা কেমন নিঃসঙ্গ আর নিঃসংঘ অসহায় হয়ে উঠেছে দিনদিন।
(হুমায়ুন, ২০০৮: ১৪৯)

যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল কাব্যের অর্ন্তগত 'গরু ও গাধা' কবিতায় গরু ও গাধা প্রতীক অবলম্বন করে তাঁর সময়ের রক্তপুঁজগন্ধমাখা সমকালের অন্ধকারকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আলোচ্য কবিতাটি রচনার সময়কাল স্বৈরাচারের কবলে জর্জরিত দেশ-জনগণ-শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গন। অসৎ, লোভী স্বার্থপর প্রকৃতির বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীদের তখন একচ্ছত্র দাপট। এমন কলুষিত সময়ে কবির ঈর্ষা করার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। কবির সহজ অথচ তির্যক বাণী: 'আজকাল আমি কোনো প্রতিভা ঈর্ষা করি না' পাঠক সমাজের মর্মমূলে প্রোথিত হয়। জীবনানন্দ দাশের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতার শকুন ও শেয়াল, শামসুর রাহমানের 'বামনের দেশে' কবিতার শৃগাল-ভালুক-কাক হুমায়ুন আজাদের কবিতায় এসে গরু ও গাধার অবয়ব ধারণ করে। জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান ও হুমায়ুন আজাদ– এ তিনজন কবিই সমকালের অন্ধকারের বিকট রূপ দর্শন করতে বাধ্য হয়েছেন। পতিত অন্ধকারের মাঝেই তাঁরা স্বকালকে ধারণ করেছেন। সময়ের হন্তারক বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে আরো শানিত করতেই হয়তো কবি গরু ও গাধার প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর কবিতায়।

প্রেম, ভালোবাসা, নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রেমের অনুভাবে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকে কবির শরীরী তৃষ্ণার অতল ভূগোল। কামগন্ধহীন প্রেম তাঁর আরাধ্য নয়। তাঁর 'সবুজ সাবমেরিন' শীর্ষক কবিতায় ফ্রয়েডীয় লিবিডো তাড়না, তাঁর বৈশিষ্ট্যসঞ্জাত প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্পের সমাবেশ ঘটেছে। চকিতে বোদলেয়ার ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-বৈশিষ্ট্যের কথা সচেতন পাঠকের মনে পড়ে। আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশেষত মধ্যবিত্ত নাগরিকবোধের অন্তঃসারশূন্যতা, অস্তিত্বসংকট আলোচ্য কবিতার প্লট নির্মাণ করেছে। কখনো তাঁর কবিচৈতন্যে রোমান্টিক প্রেমভাবনার সঙ্গে মিশে যায় ইতিহাসচেতনা, স্বদেশ-ভূগোল-প্রকৃতি ও নানামাত্রিক মায়াপ্রপঞ্চ। আজাদ প্রেমিক। তবে সেই প্রেম নিবেদন বা প্রকাশ কখনোই নরম হাতের, আয়েশি ভঙ্গিমার নয়। প্রেম এবং বিদ্রোহের সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে আরো বেশি স্পষ্ট আরো বেশি বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন আজাদ। প্রকৃত প্রেমিকের মনোবেদনা রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'প্রেম ভালোবাসা' শীর্ষক কবিতায় প্রেমকে কবি উপস্থাপন করেছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রেমঘটিত বিরহবোধ, অনিদ্রা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে 'রাত্রি' কবিতায়। 'ছাদ আরোহীর কাসিদা' ও 'যদি তুমি আসো' কবিতায় প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহজনিত নৈঃসঙ্গচেতনা, আত্মহননের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে ইমপ্রেশনিস্টিক ট্রিটমেন্ট, চিত্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে। পুঁজিবাদ কীভাবে প্রেমের স্বরূপকে বদলে দিয়েছে, প্রেমিকারা প্রেমিকের সোনালি বউ না হয়ে কীভাবে ধনীদের উপপত্নী হয়েছে তার কথা রয়েছে 'শ্রেণীসংগ্রাম' শীর্ষক কবিতায়। কবি এত বেশি রাজনীতি সচেতন ছিলেন যে, রাজনীতি ও প্রেম তাঁর কবিতায় সমভাবে সমসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত প্রেমকে তিনি বাস্তব জগৎ থেকে আলাদা করে দেখতে পারেননি বা চাননি। 'গৃহনির্মাণ' 'হরোস্কোপ' 'আমার ছাত্র ও তার প্রেমিকার জন্য এলেজি'

শীর্ষক কবিতায় কবির রাজনীতি ও প্রেমভাবনার স্বরূপ প্রকাশিত রয়েছে। শরীর প্রেম, যৌনসর্বস্বতা তাঁর কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। 'মাতাল' কবিতাটি তারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত−'সুপার মার্কেটের দুধেল তরুণীরা/ করে বিকিরণ কামের তীব্র রশ্মি' (হুমায়ুন, ২০০৮: ৮১)। প্রেমহীন দাম্পত্যকে কবি ঘৃণা জানিয়েছেন 'অন্ধ যেমন' কবিতায়। সবকিছুর ওপরে প্রেম, যেখানে প্রেম নেই তা মূল্যহীন। আজাদের প্রেম কোনো প্লেটোনিক প্রেম নয়, শরীরী প্রেম, দেহাশ্রিত প্রেম। 'তুমি সোনা আর গাধা করো', 'না, তোমাকে মনে পড়েনি' 'তোমাকে ছাড়া কী ক'রে বেঁচে থাকে' 'আমাকে ভালোবাসার পর' ইত্যাদি কবিতায় আজাদের প্রেমভাবনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক, প্রেমকে গুরুত্ব দিয়েছেনে সমস্ত বিধি-প্রথা-পরম্পরার ওপরে। বর্বর সমাজে চিরকালই সামরিক আইন ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে, যেখানে সবকিছু সিদ্ধ, নিষিদ্ধ শুধু প্রেম। আজাদের 'সামরিক আইন ভাঙার পাঁচ রকম পদ্ধতি' শীর্ষক কবিতায় প্রেমের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। 'তুমি, বাতাস ও রক্তপ্রবাহ', 'এপিটাফ', 'আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর' ইত্যাদি কবিতায় কবির প্রেমভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'একাদশ প্রেম' কবিতায় কবি বহুগামিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। কবি মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজে একনিষ্ঠ প্রেম, একজনের প্রতি প্রেম, অপেক্ষা−এসব থাকে না বা অসম্ভব। 'তরুণীরা' ও 'নপুংসক' কবিতায় বহুগামিতা অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি তাঁর কবিতায় চিহ্নিত করেছেন নারীর জীবনে পারিবারিক চিত্র। তিনি কঠিন কঠোর চিন্তার পাশাপাশি মোলায়েম আর তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন প্রেমের কথা। 'কতোবার লাফিয়ে পড়েছি' শীর্ষক কবিতায় হুমায়ুন আজাদকে দেখি তরুণ প্রেমিক রূপে অথচ তিনি ভীষণভাবে সমাজচেতনায় আঘাত করেছেন বার বার, যদিও তিনি ট্রাডিশনাল বিদ্রোহী নন, কিন্তু তাঁর গদ্যের মতো কবিতায় রেখেছেন প্রথাবিরোধের প্রবল দার্শনিক ছাপ। হুমায়ুনের প্রেমভাবনার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

ক. কুকুর যেমন সব-কটি দাঁতে গেঁথে রাখে প্রিয় মাংস
গেঁথে রাখি দাঁতে
তোমার শরীর এবং রূপের অধো আর উর্ধ্বাংশ (হুমায়ুন, ২০০৮: ৭৬)

খ. হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি
উৎফুল্ল হয় না কিছুতে−প্রেমে, পুষ্পে, সঙ্গমে ও সুখী
হয় না কখনো; আপন রক্তের গন্ধে অসুস্থ, তন্দ্রায়
ধ্বংসের চলচ্চিত্র দেখে, ঘ্রাণ শুঁকে সময় কাটায় (হুমায়ুন, ২০০৮: ৯৭)

গ. আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার
যেমন হিরোশিমার পর আর কিছুই আগের মতো নেই
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত। (হুমায়ুন, ২০০৮: ১০৭)

ঘ. তুমি তো যাচ্ছ চলে আমাকে কিছু দাও।
দাও বিষ করি পান, রক্ত করে দিই রক্তনালীতে
প্রত্যহ বইবো দেহে সে দুর্লভ উপহারস্মৃতি (হুমায়ুন, ২০০৮: ৮৪)

হুমায়ুন আজাদ আজীবন পুরুষতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণে জৈবিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা, যুক্তি, মূল্যায়ন, বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে কোনো কার্পণ্য করেননি। তিনি প্রতিষ্ঠিত চেতনায় আঘাত করেছেন অবলীলায় কঠিন সত্যের প্রয়োজনে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গড়া প্রথা-পরম্পরাকে পদদলিত করে প্রত্যাশা করেছেন নারীর জাগরণ 'আত্মজৈবনিক', 'একুশ বছর বয়সে', শীর্ষক কবিতায়। আজাদ সিমন দ্য বোভেয়ার, জন স্টুয়ার্ট মিল, রোকেয়ার নারীবিষয়ক চিন্তার যৌক্তিকতা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরে প্রমাণ

করেছেন পুরুষতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু নারীর মুক্তি অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। 'জল দাও, বাতাস' শীর্ষক কবিতায় আজাদের নারীভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। নারীর 'মা' পরিচয়কে কবি গর্বের মনে করেননি। সন্তানকে কবি জঞ্জালের সাথে তুলনা করেছেন। আর এভাবে আজাদ তীব্র আঘাত হেনেছেন হাজার বছরের বিশ্বাস-প্রথা-পরম্পরার প্রতি। 'স্ত্রীরা' কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কেমন, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা আইনকে শ্লেষ করে কবি বাস্তবতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আজাদের নারীভাবনার স্বরূপ বোঝাতে কবিতার প্রাসঙ্গিক চরণসমূহ নিম্নরূপ:

ক. শান্তির শঙ্কিত বাণী ভেসে যায় তিক্তশ্বাস গ্যাসের তাড়নে;
ধর্মগ্রন্থ পদতলে, রাজনীতি নীতিহীন, ঘোলাটে আকাশ
হে নারী, অবিদ্যাময়ী, পাঠ দাও সুপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতনে,
অগ্নিতে বিলুপ্ত হোক শত শত মনীষার রচিত দর্শন। (হুমায়ুন, ২০০৮: ২০)

খ. কী আশ্চর্য বহুকষ্টে সকাতর দশমাস কেটে গেলে পর
কেবল জঞ্জাল জন্মে সুস্থতম মেয়েটির পেটের ভেতর। (হুমায়ুন, ২০০৮: ২০)

গ. স্বামীদের জন্যে আছে একাধিক উপপত্নী, সভা, উল্লসিত বিদেশ ভ্রমণ
বাতিল শুধুই তারা ? ময়লায় পরিণত শুধু তাদেরই জঘন ?
তবুও সযত্নে টিকিয়ে রাখতে হবে নিরন্তর একটি উৎসাহ
আঁকড়ে থাকতে হবে - সবাই পণ্ড যদি পণ্ড হয় পবিত্র বিবাহ। (হুমায়ুন, ২০০৮: ২১৫)

আজাদের নারী ভাবনার মধ্যে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকার বিষয়টি বারবার উত্থাপিত হওয়ায় তাঁর কবিতায় নারীর ক্ষমতায়নের ছদ্ম-বাসনার ছাপ রয়েছে, যা তাঁর কবিতাকে অনন্য করেছে।

সাধারণ মানুষের বোধে যে সমাজ আধুনিক সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত; আসলে সে সমাজ যে কতটা ভঙ্গুর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মীয় বাড়াবাড়িতে বিপর্যস্ত; হুমায়ুন আজাদ পটকা মাছের ন্যায় ফুলে-ফেঁপে থাকা সে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল কাঠামোয় আঘাত হেনেছেন। তাঁর কবিতার শব্দেরা রাষ্ট্রের ও ধর্মের ভেতরাঙ্গিককে বিস্ফোরিত করেছে, তছনছ ও বিধ্বস্ত করেছে। কবি মনে করেন যারা নেশান্ধ, মোহগ্রস্ত কেবল তারাই বিশ্বাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কবির ভাষায়: 'আমার বিশ্বাস মৃত,/ সে কখনো মদস্রাবী পিপাসা আনে না,/ শোক ছাড়া এ হৃদয় আর কোনো বান্ধবীর ঠিকানা জানে না' (হুমায়ুন, ২০০৮: ২০)। বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীরা অত্যন্ত আবেগ প্রবণ, সর্বক্ষেত্রে তারা পশ্চিমা সংস্কৃতির দোষারোপ করে। 'বঙ্গ উন্নয়ন ট্রাস্ট' শীর্ষক কবিতায় কবি তাই উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কবি মনে করেন পশ্চিমাদের কারণে বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হয় না, বাংলার প্রধান শত্রু আবেগের আতিশয্য, বাস্তবতাবিবর্জিত জীবনবোধ, রোমান্টিক মনোচেতনা। 'প্রার্থনালয়' শীর্ষক কবিতায় কবি প্রকাশ করেন কীভাবে ধর্মের নাম করে সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতি, সম্পদ লুণ্ঠন করে। ধর্মগুরুরা বলে আসমান থেকে জমিন পাপাচারে ছেয়ে গেছে তাই মানুষের এখন একমাত্র কাজ প্রার্থনা। কবি শ্লেষের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন সেই পাপ আসলে ধর্মগুরুদের কৃত যাদের তিনি 'অজস্র শক্তিশালী মুখমণ্ডল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'তুমি আসবে' শীর্ষক কবিতায় কবি প্রতীকী পরিচর্যার মাধ্যমে নরক সদৃশ বাংলাদেশ এবং সেই নরকের কীট সদৃশ ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। 'বৃদ্ধদের মধ্যে' কবিতায় সামন্ত মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধদের আচরণে বৈপরীত্য ও ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বৈপরীত্যের সার্থক সৃষ্টি "বিশ্বাস" প্রত্যয়টিকেই সংশয় ফেলে; যা আজাদের দার্শনিক অবস্থান আরো পরিষ্কার করে তোলে। কবিতার আধুনিকতা আনয়নে এর ভূমিকা বহুস্তরিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

'সুররিয়ালিজম' বা 'পরাবাস্তবতা' কবিতায় বিংশ শতাব্দীর অভিনব সাহিত্য উপাদান লক্ষণীয়। মানুষের মনের চেতন ও অচেতন অবস্থার উর্ধ্বে যে একটি অবচেতন স্তর বিরাজ করে সে অবচেতনের গহীন থেকে উঠে আসা বাস্তবের অধিক বাস্তব আপাত অবাস্তবই পরাবাস্তবতা। আহমদ রফিক বলেন: 'পরাবাস্তববাদী কবিতা প্রতীক ও বাকপ্রতিমার রূপৈশ্বর্যগত গুণগ্রাম ধারণ করেও ভাষার জাদুকরি ব্যবহারের তুলনায় মানব কল্পনাশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে বেশি' (আহমদ, ২০০১: ৭৫)। সামাজিক সংকট, সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত শ্রেণিচেতনা এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানোর শৈল্পিক চিন্তা নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে 'সুররিয়ালিজম' বা 'পরাবাস্তবতা'র সূচনা। 'পরাবাস্তবতা' শোভন চিত্তপ্রবাহী কবিতা রচনায় আজাদের মুন্সিয়ানা রয়েছে। 'বৃষ্টি নামে' শীর্ষক কবিতায় পরাবাস্তবতার সুনিপুণ প্রয়োগ করেছেন হুমায়ুন। কবি লেখেন: 'বৃষ্টি নামলেই পথের সড়ক ট্রেন বিমান চালক আরোহী সবাই গ'লে/ গাঢ় অভ্যন্তরে শাদা ধবধবে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে যায়।/ আমার শরীল গলে সোঁদামাটি,/ টের পাই বুকের বাঁ দিকে মাটি ঠেলে উদ্ভিদ উঠছে।/ আমি তার সরল শেকড়'(হুমায়ুন, ২০০৮: ২৫)। 'টয়লেট' কবিতায় রয়েছে পরাবাস্তব বর্ণনা। প্রতীক ও পরাবাস্তব বর্ণনায় ঋদ্ধ 'সবুজ সাবমেরিন' কবিতাটি। তাছাড়াও কবিতাটিতে সমাবেশ ঘটেছে ফ্রয়েডীয় লিবিডো তাড়না, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্পের। 'নৌকো' শীর্ষক কবিতায় কখনো পরাবাস্তবতা, চিত্রকল্প ও বিবৃতিধর্মিতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। 'পোশাক পরিচ্ছদ' কবিতাটিতেও রয়েছে পরাবাস্তব বর্ণনা। 'পরাবাস্তব বাঙলা' ও 'আধঘণ্টা বৃষ্টি' কবিতায় পরাবাস্তবধর্মী বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। 'নিরাময়' কবিতায় পরাবাস্তবধর্মী বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ইম্প্রেশনিস্টিক ট্রিটমেন্ট। কবি বলেন: 'মধ্যরাত্র, লাশের গন্ধ, শেয়ালের ডাক,/ তোর হ'তে থাকে আমার ভেতরে নরম কুয়াশার আর শিশিরের/ রূপ গ'লে গ'লে' (হুমায়ুন,২০০৮: ২২৫)। কখনো আজাদ পরাবাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সমন্বয়ে নিজের মনোভাবনা প্রকাশ করেন 'সান্ধ্যআইন' শীর্ষক কবিতায়। হুমায়ুনের কবিতায় পরাবাস্তব বর্ণনার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

ক. কি আর করতে পারতে তুমি, কি বা করতে পারতাম আমিই তখন
চারদিকে ছড়ানো সন্ধ্যা আর তার হিংস্র নীতিমালা
একটা মুমূর্ষু পাখি থেকে থেকে চিৎকার করছিলো তীক্ষ্ণ সাইরেনে।
নিষেধ রাস্তায় নামা, বাইরে চোখ ফেলা; তুমি-আমি, সে সন্ধ্যায়
কি আর করতে পারতাম পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৬৯)

খ. ..প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি একটা লজ্জিত রিকশা ও
দুটো চন্দনা পাখির সামনে একটা রাইফেল একজোড়া বুট–
তিনটা শিরস্ত্রাণের সঙ্গে সঙ্গম সারো। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৭২)

প্রকৃতির অনিন্দ্যসুন্দর উপকরণ কবিকে মুগ্ধ করে তীব্রভাবে। একটি ঘাসফুলের জন্য, টলোমলো শিশিরবিন্দুর জন্য, চৈত্রের বাতাস উড়ে যাওয়া একটি পাপড়ির জন্যও তিনি মরে যেতে পারেন। 'ভালো থেকো' কবিতায় কবি প্রকৃতির এসব প্রিয় অনুষঙ্গের প্রতি তীব্র আকুতি জানিয়ে বলেন: 'ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো/ ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো।' আজাদের এই কবিতায় বাংলার প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতি চমৎকার সজীব ও প্রাণবন্ত রূপে ধরা দিয়েছে। বাঙালির নান্দনিক সৌন্দর্যচেতনার অনুপম নিদর্শন কবিতাটি। সমগ্র বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতি যেন চকিত চমক দিয়ে ওঠে এ কবিতার ক্যানভাসে। কবি বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে পারছেন না, সভ্যতার করাল গ্রাস মানবজীবনকে করেছে বিষময়। কবি তাই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন 'পাপ' শীর্ষক কবিতায়। কারণ সমকাল কবিকে করেছে দগ্ধ, বিবিক্ত, বিচ্ছিন্ন। 'শ্লোগান' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন: আমি একা, শূন্য বৃক্ষ, দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠাণ্ডা শূন্যতার

মুখোমুখি (হুমায়ুন, ২০০৮: ৭০)। জীবনানন্দীয় প্রভাব কবিতাটিতে স্পষ্ট 'এক দশক পর রাড়িখালে' কবিতাটিতে কবির প্রকৃতিচেতনার পাশাপাশি কবির স্মৃতিকাতরতা ভাষারূপ পেয়েছে। কবির শৈশব, হারানো মধুর দিনগুলো সব চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কবি চাইলেও আর ফিরে যেতে পারবেন না সেই অসচেতন, নির্ঝঞ্ঝাট শৈশবে। কবির ভাষ্য: 'আমি শুধু একলা গাড়িতে/ চাপা পড়তে লাগলাম/ চাপ চাপ মাটির গভীরে' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৯৯)। 'রাড়িখালে এলে' শীর্ষক কবিতায় একই সুর প্রবাহিত হয়েছে। হারিয়ে ফেলা দিনের প্রতি স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে 'এইতো ছিলাম শিশু' শীর্ষক কবিতায়। 'মানুষ ও প্রকৃতি একইভাবে বাঁচে মরে' কবিতায় কবির একটি দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে যে, মানুষের মতোই প্রকৃতির সৃষ্টি, বিকাশ ও বিলয় আছে। 'সামান্য মানুষ' কবিতায় পুঁজিবাদী সমাজে কবি তাঁর অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। পুঁজির প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার বাহাদুরি তাঁর কাছে গোবরের মতো তুচ্ছ। তিনি আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চান। উৎপাদনশীল কৃষি সমাজ তাঁর কাছে পরম কাম্য। 'বাবা ও মায়ের প্রতি' শীর্ষক কবিতায় যে সবকিছু হারিয়ে যায় তার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন আজাদ। সামন্ত মানসিকতা আজাদ সরোষে এড়িয়ে চলেছেন; তবে পুঁজিবাদেও তিনি আস্থাশীল নন। বিত্তের চাপে পর্যুদস্ত মনুষ্যত্বকে বিনির্মাণের জন্যই স্মৃতিকাতরতাকে কবিতার আরাধ্য করেছেন তিনি।

বিশ শতকের ষাটের দশক বাংলা কবিতার জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এ সময়ের অধিকাংশ কবিই প্রচুর কবিতা লিখেছেন। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের আগের দশকের এই কবিরা রাজনৈতিক যে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা, সেই রক্তাক্ত স্মৃতি, স্বজন হারানোর বেদনা আর শাসকের হাতে শোষিতের লাঞ্ছনার বেদনার ভেতর দিয়ে তারা পুষ্ট হয়েছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও মাটির প্রতি যে শ্রদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়েছে। নয় মাসের সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের লাল-সবুজ পতাকার প্রতি তৈরি হয়েছে ভালোবাসা। মুক্তিযুদ্ধই আমাদের ভেতর তীব্র স্বদেশচেতনার উন্মেষ ঘটায়, করে তোলে গণসম্পৃক্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের যে সময় পর্ব, তা পুনর্গঠনে স্বপ্নোন্মুখ জাতির কাছে বড় বেশি ধীর মনে হয়েছে। ফলে খুব দ্রুতই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বেদনার্ত হতে থাকে মানুষ। হুমায়ুন তাঁর কবিতায় এই সংকটকে ধারণ করেছেন। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি কবির অগাধ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বেশ কিছু কবিতায়। 'মুক্তিবাহিনীর জন্যে' কবিতায় পাকবাহিনীর প্রতি অশেষ ঘৃণা ও মুক্তিবাহিনীর জন্য অফুরন্ত ভালোবাসার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'তোমার পায়ের শব্দে বাঙলাদেশে ঘনায় ফাল্গুন/ ৫৬০০ বর্গমাইলের এই বিধ্বস্ত বাগানে/ এক সুরে গান গেয়ে ওঠে সাত কোটি বিপন্ন কোকিল' (হুমায়ুন,২০০৮: ১৫৪)। 'রেস্তোরাঁর পার্শ্ববর্তী টেবিলের তরুণের প্রতি' শীর্ষক কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বর্ণনা এসেছে প্রেমের সমান্তরালে 'আমার গৃহ' শীর্ষক কবিতায়। কবি ও কবিতার বন্দনা, স্বাধীনতার মূল্য যে কবি ছাড়া আর কেউ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কবিতার মূল্য যে সমস্ত পুঁজি-অর্থ-সম্পদের থেকেও বেশি তার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে 'এ-সভা প্রস্তাব করেছে' কবিতায়। যুদ্ধ পূর্ববর্তী বাংলাদেশ, যুদ্ধে খোকনের অংশগ্রহণ, যুদ্ধে শহিদ হওয়া, যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ ও অপত্যস্নেহের এক হৃদয়বিদারক অনন্য, অসাধারণ কবিতা 'খোকনের সানগ্লাস'। 'বন্যা ১৯৮৮' কবিতায় কবি বাঙালির প্রতিবাদের সুরকে ভাষারূপ দিয়েছেন। কবিতায় ভাষ্য: 'একাত্তরে একবার আশ্চর্য বন্যা এসেছিলো, ওই বন্যায় ভেসে/ গিয়েছিলো পাকিস্তান নামক একটি নোংরা বাঁধ' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৭৬)। মহান মুক্তিযুদ্ধকে ইন্দ্রিয়ের আঁচে কবিতার শরীরে বেঁধেছেন তিনি।

নিজেকে দেখার বা নিজের সম্পর্কে বলবার বা নিজের প্রতিকৃতি আঁকবার চেষ্টা সব কবিই কম বেশি করে থাকেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। হুমায়ুন আজাদ তাঁর বেশ কিছু কবিতায় নিজের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। 'জীবনচরিতাংশ' কবিতাটি কবির আত্মজৈবনিক কবিতা। প্রত্যাশা, অপ্রাপ্তি, প্রতিকূল পরিবেশ, ষড়যন্ত্র,

অবমূল্যায়ন, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। 'যাও রিকশা, যাও' ও 'হুমায়ুন আজাদ' কবিতা দুটি কবির আত্মজৈবনিক কবিতা। এখানে রয়েছে ইতিহাস, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, স্মৃতিবিধুরতা, তথাকথিত স্বাধীনতা, স্বাধীনতার স্বরূপ, রাজনীতিবিদদের নৃশংসতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ। 'ভিখারি' কবিতায় কবি বাঙালি জাতির সমালোচনা করেছেন। বাঙালিকে বলেছেন দেহসবর্স্ব, ভিক্ষুক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতি। এদের মধ্যে শিল্পবোধ, রুচিবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ নেই বলে মনে করেছেন কবি। বিরুদ্ধ সময় ও স্বকাল কবির মননকে করেছে বিধ্বস্ত। মানবিকতার চরম অবক্ষয়ের দিনে কবি পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিকুল বিশেষ করে নজরুল, যতীন্দ্রমোহন, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীনকে স্মরণ করেছেন। মানবিক আবেগ-অনুভূতি যাঁদের কবিতায় নান্দনিকতা পেয়েছে, তাঁদের সেই পদ্যে কবি শূন্য বুক ভরে নিতে চান। অন্যদিকে 'দলীয় কবিদের প্রশংসায় কয়েক পঙ্ক্তি' কবিতায় শ্লেষের মাধ্যমে কবি রাজকবি বাল্মীকি থেকে শুরু করে তাঁর সমগোত্রীয় দলীয় রাজকবিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। একজন কবি হন সত্যের পূজারি। সত্য প্রকাশ করাই কবির ধর্ম অথচ রাজকবিরা সবসময় সত্য গোপন করে রাজার মহিমাকীর্তন করে যান। আজাদ তাই তাঁদেরকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে' শীর্ষক কবিতাটি কবির একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা বোঝানোর জন্য একটি মাইলফলক। কবি বলেন: 'আমি যে পৃথিবী চেয়েছিলাম, তাকে আমি পাইনি।/ তখনো আমার বয়স আসেনি।/ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৬৩)। কবির এই হাহাকার আরো প্রগাঢ় হয়েছে 'পর্বত' শীর্ষক কবিতায়। নিজের একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবোধ যেমন তাঁকে আক্রান্ত করেছে তেমনই আক্রান্ত করেছে নিজের ভুলও। অবশ্য সেই ভুলগুলোর দিকে তাঁর দৃষ্টি যেন অনেকটাই নম্র। কবি বলেন: 'ভুলগুলো আমার সুন্দর করুণ ভুলে যাওয়া ভুলগুলো/ যে-জলে সাঁতার দিলে পেতে পারতাম অমরতা' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৭২)। 'কী রকম আছি' কবিতায় রয়েছে এক বীভৎস বর্ণনা যা স্বকালে কবির নাগরিক প্রতিবেশে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে। কবি লেখেন- পাঁচটি বাস সংঘর্ষে লিপ্ত, পিষে গেছে একশ পঁচিশটি লাশ,/ ছিটকে পড়েছে হলদে মগজ,/ গন্ধে ভরা ঢাকার আকাশ,/ একটুকু হাহাকার, হাতে মুখ ঢেকে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কাছাকাছি,/ তাহলে ও বুঝতে পারবে না আমি কী রকম আছি।' 'শ্রাবণ মাসের কবিতা'য় কবির সহজ স্বীকারোক্তি: 'নিজেকে আলপিন করে গেঁথে রাখি এক ফাইলে/ সমসাময়িক আর মহাকাল' (হুমায়ুন, ২০০৮: ২৩২)।

পুঁজিবাদী সভ্যতার বিপরীতে উৎপাদনশীল কৃষি সভ্যতার তুলনা করেছেন কবি 'মুখ তুলে ধরি' শীর্ষক কবিতায়। কবি লেখেন: 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না ব'লেই সমগ্র ভূভাগব্যাপী/ মাথা তোলে দারুণ ছত্রাক/ বাড়ে পুলকিত আগাছার ঝাড়,/ একটি বিশাল নদী সৌরমরুভূমে নিরর্থক ব'য়ে আনে জল'(হুমায়ুন, ২০০৮: ৯৯)। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণিব্যবধান, শোষণের স্বরূপ উল্লেখ করে শ্রমিকদের সচেতন করতে চেয়েছেন কবি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন 'বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন আপনারা শোষণ উৎপাদন করছেন' শীর্ষক কবিতায়। 'গোলামের গর্ভধারিণী' 'জীবনযাপনের শব্দ' কবিতাগুলোতে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার কথা। 'সামান্য মানুষ' কবিতায় পুঁজিবাদী সমাজে কবি তাঁর অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। পুঁজির প্রতিযোগিতা ক্ষমতার বাহাদুরি তাঁর কাছে তুচ্ছ। উৎপাদনশীল কৃষিসমাজ কবির আরাধ্য। আধুনিক নগরজীবন পুঁজিবাদের অন্য নাম। ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে ক্রমাগত বাড়ছে বৈষম্য। অবহেলিত নিম্নবিত্তশ্রেণি অপ্রাপ্তি, নৈরাশ্য ও হতাশায় নিমজ্জিত। এই অপ্রাপ্তিবোধ থেকেই শুরু হয় তাদের পঙ্কিল ক্লেদাক্ত জীবনাচরণ। কবির সমাজসন্ধানী দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি এই দুর্দশা ও অধোগতির চিত্র। পুঁজিবাদী সমাজে যে ভালোবাসা থাকে না তার প্রকাশ ঘটেছে 'ভালবাসবো, হৃদয়' শীর্ষক কবিতায়। পুঁজিবাদের উন্মেষের ফলে নাগরিক মানুষ হয়ে পড়ে বেশিরভাগই পুঁজির পূজারি। যোগ্যতার বদলে ক্ষমতাই হয়ে পড়ে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

শুভবোধের রাস্তায় আজ শোষকদের সদর্পে পথচলা। প্রত্যক্ষ অন্যায়, পঙ্কিলতার মিছিল দেখেও মানুষ আজ বিবেকের দায় থেকে মুক্ত। কবি প্রত্যক্ষ করেন সমাজের তমসাচ্ছন্ন ও স্খলিতরূপ।

আজাদ মানুষের ক্রমরূপান্তরশীল জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। মত্ত ও মহিমান্বিত যৌবন শেষে জরা ও মৃত্যুর উপস্থিতি অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব অমরা যৌবন জরাকবলিত হয়েই রূপান্তরিত হবে এবং উপনীত হবে মৃত্যুর দরজায়। *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* কাব্যে কবির উপলব্ধি সম্পর্কে সমালোচকের ভাষ্য:

> এখানে তাঁর চেতনা বিশুদ্ধতা ও অসীমত্বকে নিয়ে এমনভাবে হাজির হয় যখন অসংখ্য আয়নাতে প্রতিফলিত হতে থাকেন হুমায়ুন আজাদ আর আমরা তা দেখে দেখে বিদীর্ণ হই। মূলত কবিতাগুলোতে প্রতিধ্বনিত হয় হাহাকারবোধ, এক সুনিশ্চিত প্রস্থানের মর্মরধ্বনি। শূন্যতা আর অনুপস্থিতির পরাঙ্মুখ অবস্থানের অনুভব থেকে যেন কবিতাগুলো লেখা। (কুমার, ২০২৩: ৭২)

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে কাব্যের 'মৃত্যু' কবিতায় কবির মৃত্যুচেতনা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

> ...এখন চল্লিশ পেরিয়েছি, জীবনের সারকথা কিছুটা বুঝেছি।
> এখন আমার মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে;
> মনে পড়লেই আমার ভেতরে যেনো হঠাৎ
> হো হো করে হেসে ওঠে, হো হো করে হেসে ওঠে। (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৭০)

আজাদ তাঁর প্রিয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মত অমরতা চাননি। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে 'আরো কিছু দূর যেতে' চেয়েছিলেন। কবির 'এপিটাফ' কবিতাটি মৃত্যুচেতনাজারিত সংরাগময় ও আন্দোলিত মননের স্মারক। মনে হয় কিছুটা তাৎক্ষণিক চিত্তবিক্ষেপ থেকে তা রচিত যেখানে কবিজীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতার দ্বৈত অনুভূতি বা উপলব্ধি ক্রিয়াশীল। *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* কাব্যের 'আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে' কবিতায় কবির মহার্ঘ বেদনার পঙ্‌ক্তিগুলো ভাষারূপ পেয়েছে এভাবে:

> আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
> খুব ছোটো একটা স্বপ্নের জন্যে
> খুব ছোট দুঃখের জন্যে
> আমি হয়তো মারা যাবো কারো ঘুমের ভেতরে
> একটি ছোটো দীর্ঘশ্বাসের জন্যে
> একফোঁটা সৌন্দর্যের জন্যে
> (হুমায়ুন, ২০০৮: ২০৫)

কবির *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* এবং *পেরোনোর কিছু নেই* কাব্যদুটিতে আমরা দেখি মহৎ নিস্তব্ধতা আর নিবিড়তার আলিম্পন, ছেড়ে যাওয়ার এক আলম্ব নির্মোহ সুর, এক মর্মর নিভৃত উচ্চারণ। এই কাব্যের কবিতাগুলোতে কবি এক নিঃসঙ্গতার মন্দ্রতাকে সমারূঢ় করতে চেয়েছেন, এক নিরাসক্ততার উপারম্ভকে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন। কেননা কবি আবাদ করেছেন শূন্যতার, স্তব্ধতার, আঁধারের, মৃত্যুর। কবিতাগুলোর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে শূন্যতার রূপায়ণ, অন্ধকারের গন্ধ আর মৃত্যুর শীতল স্পর্শ, রয়েছে ঋদ্ধ ও অমোঘ একাকিত্ব। 'এমন হতো না আগে', 'রাড়িখালে এলে', 'বেশি কাজ বাকি নেই', 'শূন্যতা', 'পিতার সমাধিলিপি', 'প্রিয় মৃতেরা' কবিতাগুলো কবির অন্তরের অনন্তবিস্তৃত একাকিত্বের এবং মৃত্যুচেতনার নিভৃত উচ্চারণ।

আজাদের কবিতায় মানুষ, সময়, সমাজ ও সম্পর্কের নানাদিক কালোত্তীর্ণ শিল্পসংহতি লাভ করেছে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের অবস্থান অনুধাবন তাঁর কবিতার একটি লক্ষ্যযোগ্য দিক। *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল* কাব্যের 'গরিবদের সৌন্দর্য' শীর্ষক কবিতায় কবি প্রথাবদ্ধ সৌন্দর্য চেতনার বাইরে গরিবদের অন্তর্গত ঐশ্বর্য ও অভিব্যক্তিকে শব্দবন্দি করেছেন। গরিব মানুষের প্রতিদিনের কর্মের একটা সরল শব্দভাষ্য নির্মাণ করেছেন তিনি এবং সৌন্দর্য বিষয়ে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণার সাপেক্ষে গরিবদের অবয়ব ও উপস্থিতির একটা মূল্যায়ন ধরা পড়েছে কবিতাটিতে। গরিবদের যাপিত জীবন নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিকৃত, নোংরা, বীভৎস, অসুন্দর কিন্তু আজাদ সাতাশটি চরণে এবং দুটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় প্রথম স্তবকের ছাব্বিশটি চরণে গরিবদের কুৎসিত জীবনযাপনের বর্ণনা দিয়েছেন, শেষ চরণটিকে একটি স্তবকের মর্যাদা দিয়ে গরিবের প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভাষারূপ দিয়েছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বের যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে কবি গরিবের কুৎসিত অবয়ব উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন তার চারপাশের দেয়ালটি আমরা হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি; এ দেয়াল মূলত শোষণযন্ত্রের, পুঁজিপতি সমাজ-সভ্যতার। *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* কব্যগ্রন্থের 'বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন আপনারা শোষণ উৎপাদন করছেন' কবিতায় কবি লেখেন: 'এই রাষ্ট্র আপনাদের ও আমার মধ্যে তুলে দিয়েছে/ আকাশের সমান উঁচু আর পাথরের থেকে শক্ত আর মৃত্যুর চেয়ে হিংস্র নির্মম দেয়াল' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১৮২)। কবি মূলত শোষক সমাজের একজন হিসেবেই শোষণ ও নিপীড়নের চরিত্র উন্মোচন করেছেন। একজন সমালোচক বলেন:

> হুমায়ুন আজাদের কবিতায় বিধৃত যে অহংকারবোধ দরিদ্রের দিনযাপনের সমুদয় অনুষঙ্গে কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ বাস্তবতার নাড়ী নক্ষত্র অন্বেষণ করে বেড়ায়, তা হাজার বছরের শোষণ ও নিপীড়ন-প্রসূত ঐশ্বর্যে ভারাক্রান্ত। (তারেক,২০২০: ১০০)

এই শোষিত-নিপীড়িত মানুষগুলো হাতুড়ি চালাতে জানে, তাদের কণ্ঠে দেয়াল ভাঙার গান। আজাদের 'গরিবের সৌন্দর্য' কবিতায় কান পাতলে সেই ভাঙনের গান শুনি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা যখন রুখে ওঠে তখনই কেবল তারা সুন্দর হয়ে ওঠে। কবির ভাষ্য:

> গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না
> গরিবদের কথা মনে হ'লে সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে না কখনো।
> … … …
> শুধু যখন তারা রুখে ওঠে কেবল তখনি তাদের সুন্দর দেখায়
> (হুমায়ুন; ২০০৮: ১৩৩)

আজাদ বাস্তবতাবিবর্জিত স্বপ্ন-কল্পনালোকের কবিতাকে ঘৃণা করেন। কেবল ছন্দ-যতি মিল দিয়ে সৃষ্ট কবিতাকে কবি 'কবিতা' মনে করেন না। কবির প্রকাশিত কবিতা হবে বাস্তবের আক্রমণ থেকে সৃষ্ট কবির রক্তাক্ত হৃদয়ের ভাষিক রূপ। 'কবির লাশ' কবিতায় কবি ব্যঙ্গ করেন এভাবে: 'দীর্ঘ বিক্ষুব্ধ মিছিল/ চণ্ডস্বরে গর্জে ওঠে, ' আমরা চাই ছন্দোবদ্ধ, যতি আর মিল/ দেয়া কড়া পদ্য, কবিতার দরকার নাই' (হুমায়ুন, ২০০৮: ১১৬)। কবির শিল্পবোধ, স্বদেশচেতনা, সমকালে শিল্পের হত্যা, সভ্যতার নামে গড়া অসভ্যতার প্রকাশ ঘটেছে 'অনুপ্রাণিত কবি আর প্রেমিকের মতো' কবিতায়। মুদ্রা বনাম শিল্পকলার বর্ণনা এসেছে 'আর্ট গ্যালারি থেকে প্রস্থান' কবিতায়। কবি সুন্দরের পূজারি, কবির কাছে শিল্প-সৌন্দর্যই কেবল শাশ্বত আর সবই নশ্বর, অশ্লীল-অশুদ্ধ। আজাদ প্রকৃতপক্ষে কবিতাকে করতে চেয়েছেন প্রজ্ঞাময়, সৌন্দর্যপ্রধান, বহুবিস্তারী এক শিল্পিত মাধ্যম। লেখক জীবনের শুরুতে আজাদ প্রভাবিত এবং প্রাণিত

হয়েছিলেন দুজনের লেখনশৈলী দ্বারা; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। যাঁদের কথা তিনি স্বীকারও করেছেন:

> কবিতায় আমি ঠিক একক কোনো কবি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছি ব'লে মনে হয় না, যদিও সুধীন্দ্রনাথ বাজীবনানন্দ, এবং পশ্চিমের কোনো কোনো কবি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। গদ্যে আমি সচেতনভাবেই, তিরিশ বছর পর্যন্ত, মেনেছি বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব। তারপর আমার গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ নেই, বুদ্ধদেবও নেই। (হুমায়ুন, ১৯৯৫: ৬৩)

হুমায়ুন আজাদ ছিলেন নাগরিক জীবন, যৌনতা, ভাষা ও রাজনীতিসচেতন এক আধুনিক কবি। যিনি ভাষার বাঁক ভেঙ্গে নতুন প্রতিবাদের পথ তৈরি করেছেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে বিদ্রোহী মনন ও তীব্র আত্মপ্রকাশের প্রবণতা। অন্যদিকে গ্রামীণ ধারার কবিরা প্রকৃতি, প্রেম, ঐতিহ্য ও আবেগনির্ভর জীবনযাপনকে উপজীব্য করেন। তাঁরা গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্য, দারিদ্র্য, সাদামাটা অনুভূতির ছবি আঁকেন। আজাদের কবিতায় যেখানে আছে যুক্তিবাদ, বিদ্রূপ ও নাগরিক বেদনা, সেখানে গ্রামীণ কবিতায় রয়েছে আবেগ, নৈসর্গিকতা ও ঐতিহ্যবোধ। ফলে তাঁদের ভাবনার দিগন্ত ও ভাষার অভিব্যক্তি একেবারেই ভিন্ন।

হুমায়ুন আজাদের কবিতায় আকাঙ্ক্ষা আছে, কল্পনা আছে, আছে বাস্তবতা। তবে কখনো উদ্ভট কল্পনার জগৎ তৈরি করেন না। তিনি তার কবিতায় কল্পনার সঙ্গে আবেগ এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে উন্মুক্ত করে দেন মনঃসমীক্ষণের পথ। তাঁর অনুভব-চিন্তা-আবেগ কবিতায় কাজ করেছে আত্মপ্রকাশের উদ্দীপক হিসেবে। ব্যক্তি-কবি তাঁর কবিতার মতোই তীক্ষ্ণ, যজস্বী ও প্রথাবিরোধী সঙ্গে প্রগলভ, আত্মকৃতিমুখর ও অস্মিতাবাদী। তিনি মানবসম্পর্কের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে, আমাদের অবচেতন মন যা শনাক্ত করতে পারে না; সেই বিশেষ অবস্থাকে আন্তর্জগতের বহুরৈখিক বৈশিষ্ট্যকে আত্মপ্রকাশের বাহন করে তোলেন। মানুষের চেতন ও অবচেতনের গূঢ়তম ইচ্ছে, মৌলিক প্রকৃতি, চেতনের সঙ্গে অবচেতনের সম্পর্ক কবির নির্মোহ-নিস্পৃহ যুক্তি ও পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে কবিতায় তুলে এনেছেন। আজাদ মূলত কবিতার প্রশিক্ষিত কারিগর। তাঁর কবিতাও তাঁর নির্মাণ। আর নির্মাণশৈলীতে তিনি কখনো রিয়ালিজম, কখনো সুররিয়ালিজম, কখনো সিম্বোলিজম, এবং আরো আরো প্রচলিত কিংবা ব্যক্তিগত টেকনিক ব্যবহার করেছেন। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

ক. শঙ্খ সমুদ্রের মতো দেয়ালের নতুন চর জেগেছে একটি
আজ লতার মতোন নদী সারা রাত মুখে করে এনেছে হলুদ পলিমাটি বাঁধ দিয়েছিলাম ভৌগোলিক
তারই মধ্যে জেগে উঠেছে আমার নতুন চর
চরের গাঙচিলপ্রান্তে ভোরে রোপণ করেছি একটি গাছ
গাছ হয়ে ধীরে ধীরে গাঙচিল ছুঁয়ে ডাল মেলছে আমার শরীর (হুমায়ুন, ২০০৮: ৯১)

খ. অলৌকিক ইস্টিমার আসে সব রাতে
সব বৃষ্টি ভর করে
নদী জ্যোৎস্না ফুলদানি বেয়ে
যারা এসে নামছে জেটিতে তারা আমার গভীর আত্মীয়। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৩৯)

গ. শূন্যতাই সঙ্গ দেবে যতো দিন বেঁচে
আছো, শূন্যতাই পূর্ণ করে রাখবে তোমাকে;
শূন্যতাই পড়বে

তুমি গ্রন্থে গ্রন্থে, আর যা কিছু লিখবে
তার প্রতিটি অক্ষরে লেখা হবে শূন্যতা, শূন্যতাই
পূর্ণ করে রাখবে তোমাকে, যতো দিন বেঁচে আছে।' (হুমায়ুন, ২০০৮: ২১৫)

ঘ. বাহু সেই গাঢ় আলপিন
যাতে মানুষেরা বুকে গেঁথে রাখে আরেকজনকে (হুমায়ুন, ২০০৮: ৪৬)

হুমায়ুন আজাদের কবিতায় ছন্দকলার ব্যবহার তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের স্মারক। হুমায়ুন আজাদ তাঁর আবেগ ও কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও গদ্যছন্দে। কবি খুব সচেতনভাবেই কবিতায় আধুনিক কবিতার ভাষাব্যবহাররীতি প্রয়োগ করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত একটি কবিতার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

তখন দুপুর বিকেল হয়েছে গাছের পাতা
সোনালী এবং সবুজ এবং নরম ঘোলা
আমরা তখন পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে
আমাদের ঘিরে কুয়াশাবিকশ নদীর দোলা।
(হুমায়ুন, ২০০৮: ২১৭)

কবিতাটি ৬+৬+৫ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

হুমায়ুন আজাদ বাংলা কবিতার প্রকরণকলা ও রীতি ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিতে কবি সঞ্চার করেছেন নান্দনিকতা। উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প নির্মাণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বকবিতার আধুনিক প্রকরণতত্ত্বের প্রয়োগ, প্রচল, অপ্রচল কথ্য ভাষাভঙ্গির ব্যবহার, সমকালীন চলতি শব্দের ব্যবহার, আত্মস্বীকারোক্তিপ্রবণ মানসিকতায়, আত্মজৈবনিক ঢঙে বিবৃতিময় কাব্যভাষা তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে হুমায়ুনের কবিতায় উপমা ও প্রতীকসমূহ প্রাত্যহিক জীবন থেকে আহৃত ও ব্যাপক ব্যঞ্জনাত্মক নয়। বিবৃতিপরায়ণতা তাঁর কবিতাকে গাদ্যিক চারিত্র প্রদান করলেও অনেক ক্ষেত্রে কাব্যিক গুণ হারিয়েছে। প্রত্যেক ভাষা ও উদ্দিষ্ট বক্তব্যধর্মিতার কারণে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক। বৃষ্টি, মাছ, বাঘ, বেহালা, রিকশা, চাঁদ, জ্যোৎস্না, বাহু প্রভৃতি প্রতীক তিনি ব্যবহার করলেও সেগুলো প্রায়ই রূপকী চারিত্র পরিগ্রহ করেছে। কবির বানানরীতির স্বাতন্ত্র্য পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে যেমন শাদা, বাঙলা, বাঙলাদেশ, দুঃক্ষ, যেনো (যেন), গেছো (গেছ), কেনো (কেন), হয় নি (হয়নি), যায় নি (যায়নি), ভবিষ্যৎও (ভবিষ্যতও)। এছাড়াও তাঁর কাব্যে সমাসবদ্ধ শব্দ, বিদেশি শব্দ, স্ল্যাং ও অপ্রচলিত শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

ইংরেজি শব্দ : সেনেটারি, টাওয়েল, ব্রেসিয়ার, এডিনবরা, এমআর, টিঅ্যান্ডিটি, পেইন কিলার, লিটার, লিরিক, সফ্ট্ওয়ার, ভাইন, গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্যানাডা, হাউজ, গ্রান্টস, পোর্ক, ডলার, কোকোকোলা, ডাস্টবিন, করিডর, ফ্রিজ, ব্ল্যাডব্যাংক, ড্রয়িংরুম ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ : খোয়াব, বেহেশত ইত্যাদি।

আরবি শব্দ : দাউদাউ, কলকল, থরথর, ঝিকিমিকি ইত্যাদি।

দ্বিরুক্তশব্দ : দাউদাউ, কলকল, থরথর, ঝিকিমিকি ইত্যাদি।

সমাসবদ্ধ শব্দ : হৃদয়মন্দির, ভুরুউরুবাঁকভরা, স্বর্ণকেশিনী, পুষ্পচন্দ্র, পলিমাটিলোকে, আইনশৃঙ্খলারক্ষীবাহিনী, শৈশবকুসুমগুচ্ছ, পতঙ্গপাবকজ্যোৎস্নাখচিত, মায়ানদী, পুষ্পপ্রেমকৃষিশিল্পমেধা, শিশির অবাক ইত্যাদি।

অপ্রচলিত শব্দ : শাসাব, আপ্‌ফেল, হিমরেরেন, জাফট, লুফ্‌ট্‌হানসা, ক্রবাদুর, ব্লিট্‌স্‌ক্রীক, দুস্তম্ভব্যাপক, জনতাস্তাবকতা ইত্যাদি।

স্ল্যাং বা গালি : ছেনালি, নপুংসক, বেশ্যা, রূপজীবিনী, উপপত্নী, দালাল, কামুক, পতিতা, রক্ষিতা, ধর্মান্ধ, ডাকাত, ঘাতক ইত্যাদি।

কবির ভাষা ও অলংকার প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

উপমা – সময়ের মতো উষ্ণ তুষারের মতো শুভ্র নদী বয় জীবনের মতো পলিমাটি লোকে (হুমায়ুন, ২০০৮: ৭১)

উৎপ্রেক্ষা – যেনো মাছ পরিস্রুত জলে, নীল ঝর্ণা ঝরে নিসর্গের গুপ্ত স্নানঘরে (হুমায়ুন, ২০০৮: ৭১)

অনুপ্রাস – আলো আলোর ভেতরে আলো আঁধার আঁধারের ভেতরে আঁধার
পাথর পাথরের ভেতরে পাথর তোমরা তা জেনে রাখো। (হুমায়ুন, ২০০৮: ৪৯)

সমাসোক্তি – নিয়ত পাল্টায় ভোল পৃথিবীটা, নদী চর জাহাজের বাঁশি (হুমায়ুন, ২০০৮: ২০)

অন্যাসক্তি – নিরহঙ্কার জ্যোৎস্না মোর ব্যালকনিতে
পবিত্র শিশিরে নামো মৃদু পদপাতে
(হুমায়ুন, ২০০৮: ২৭)

প্রতীক – বড়শিতে গাঁথা মাছ সারি সারি ঝুলছে দেয়ালে
নিপুণ ধীবর সংঘ শুঁটকি ক'রে রেখে দিচ্ছে সাধের শিকার
বাতাসে সুগন্ধ ডামে ছুটে আসে দল বেঁধে
মাছি ডাঁশ শবাহারী পোকা (হুমায়ুন, ২০০৮: ২৫)

(এখানে 'বড়শিতে গাঁথা মাছ', 'নারী'র প্রতীক এবং 'মাছি' 'ডাঁশ' 'শবাহারী পোকা' পুরুষের প্রতীক)
চিত্রকল্প – একটি বর্ণাঢ্য বাঘের সৌন্দর্যে-স্বপ্নে-ক্রোধে দিগন্তের পুব পার থেকে

অভ্র - বন্যা ভেদ করে আমার ঘাড়ের ওপর
লাফিয়ে পড়লো টকটকে লাল একটা হিংস্র গোলাপ।(হুমায়ুন, ২০০৮: ৭১)

বিরোধাভাস – মাংসল যুবতী

দশটা গুণ্ডার সাথে ঘুম যায়, তবুও কী বিস্ময়কর সতী ! (হুমায়ুন, ২০০৮: ১১৬)

বিশেষণ – ফসলভারাতুর উজ্জ্বল সোনালি তীক্ষ্ণ সাংঘাতিক ব্লেড (হুমায়ুন, ২০০৮: ৬৫)

কাব্যসমগ্রে আজাদের নয়টি কিশোর কবিতা সংকলিত হয়েছে। যেখানে বিষয় প্রকৃতির বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ, নিসর্গের সাথে কবির সম্পর্ক, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, শৈশবের প্রতি স্মৃতিকাতরতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। আঙ্গিকগত দিক থেকেও কবিতাগুলো বিশিষ্ট। ছন্দ পরিক্রমায়, স্তবকবিন্যাসে,

পরাবাস্তব বর্ণনায়, কল্পনার অতিশয়োক্তিতে, রোমান্টিক চেতনায় কাব্যশরীর চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর *কাব্যসমগ্র-এ* অগ্রন্থিত কবিতা রয়েছে তিনটি। কবিতাগুলোতে সময়ের নিষ্ঠুরতা, প্রেম-বিরহ, স্বকালভাবনা প্রকাশিত হয়েছে যা আজাদের সাতটি কাব্যের মূলসুরগুলোরই অনুরূপ। সমকাল ও প্রকৃতি থেকেই তিনি এসব কবিতার অলংকারের উপাদান বেছে নিয়েছেন। আজাদ আজীবন মানুষের সঙ্গে মানুষের গাঁথাই নির্মাণ করে গেছেন শব্দের ঐন্দ্রজালিকতায়, ভাবনার বিচিত্র শঙ্খনাদে, সৃষ্টিশীলতার অভাবনীয় ভাবনার বিস্তারে। প্রচলিত প্রথা ও সীমাবদ্ধতার সকল দেয়াল ভেঙ্গে তিনি নিজের মহাসড়ক নির্মাণ করেছেন অবলীলায়, সাহসের তরবারি হাতে এগিয়ে গিয়েছেন সকল মূর্খতা, অন্ধকার আর দেয়ালের বিরুদ্ধে। হুমায়ুন আজাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং আত্মানুসন্ধানী। আধুনিক বাঙালির আত্মপ্রতিকৃতির চিহ্ন রেখেছেন কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। আজাদের কবিতার নির্মিতিতে তির্যক চেতনাপ্রবাহ, স্বচ্ছ শাব্দিক ও বাক্যিক উপস্থিতি, শাণিত ও পরিণামী ভাষারীতি, মর্মভেদী উপস্থাপনা তাঁকে আত্মপ্রতিকৃতিময় আধুনিক বাঙালি কবিতে পরিণত করেছে।

হুমায়ুন আজাদের কবিতায় আধুনিক বাঙালির আত্মপ্রতিকৃতি এক জটিল, দ্বান্দ্বিক ও পরিহাসভরা রূপে উদ্ভাসিত। তিনি যেমন বাঙালির ভাষাচেতনা, ইতিহাসবোধ ও আত্মমর্যাদার জাগরণকে কবিতার বিষয় করেছেন, তেমনি তুলে ধরেছেন তার নৈঃসঙ্গ্য, আত্মপ্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক ছলনার মুখোশ। আজাদের কবিতায় যে বাঙালি দেখা যায়, সে একদিকে ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারভিত্তিক আত্মমর্যাদাশীল, অন্যদিকে তীব্রভাবে আত্মবিভক্ত, সংকীর্ণ স্বার্থে নিমজ্জিত ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় অসংগঠিত। এই দ্বৈত প্রতিকৃতি কবিকে এনে দেয় সমাজ ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে এক দ্বিধান্বিত বোধ–যা তাঁর কবিতাকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, একই সঙ্গে আত্মসমালোচনার আয়ূধে পরিণত করে। আধুনিক বাঙালির আত্মনির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় হুমায়ুন আজাদের কবিতা হয়ে ওঠে ভাষার রাজনীতি, ইতিহাসের নির্মাণ, যৌনতার সামাজিকীকরণ ও ধর্মান্ধতার মুখোশ উন্মোচনের এক শাণিত নথি। তিনি বাঙালিকে দেখেছেন নিজের চোখে, কিন্তু সেই অবলোকনের মধ্যে আছে কবির বিদ্রোহ, করুণা, হতাশা ও আশার মিশ্র প্রতিধ্বনি। হুমায়ুন আজাদের কবিতা আধুনিক বাঙালির আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণে এক অপরিহার্য শিল্পভাষ্য।

আকরগ্রন্থ:

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *কাব্যসমগ্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

আবুল হাসান (২০১২)। *রচনাসমগ্র*, পঞ্চম, সংস্করণ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

আহমদ রফিক (২০০১)। *কবিতার আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।

কুদরত-ই-হুদা (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ: বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কুমার চক্রবর্তী (২০২৩)। *মৃতদের সমান অভিজ্ঞ হুমায়ুন আজাদ*, উজান, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম (২০২১)। হুমায়ুন আজাদ-এর কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ: কবি ও কাব্য পরিক্রমা। *প্রথাবিরোধী হুমায়ুন আজাদ* [সম্পা: রনজু রাইম] কবিতা সংক্রান্তি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রফিক আজাদ (২০১৩)। *অসম্ভবের পায়ে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিভাস, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *রবীন্দ্র রচনাবলি*, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শহীদ ইকবাল (২০১৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০২১)। *ষাটের কবিতা: ভালোবাসার শরবিদ্ধ কবিকুল*, বিভাস, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৩)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৫)। *আততায়ীর সঙ্গে কথোপকথন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি:

তারেক রেজা (২০২১)। *হুমায়ুন আজাদের গরিব মানুষ: সৌন্দর্যতত্ত্বের বিকল্প প্রস্তাব*, ভাষা-সাহিত্যপত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।